গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৪০ সংখ্যা | ১৯ - ২৫ মে ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

শোষিত মানুষের মুক্তির দিশারি
মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক
কমরেড শিবদাস ঘোষ

জন্মশতবর্ষ পালন করুন

৫ আগস্ট ২০২২ - ৫ আগস্ট ২০২৩

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়ে গেলেন অমিত শাহ

গত ৯ মে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কলকাতার সায়েন্স সিটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর নাম করে বলে গেলেন, 'গুরুদেবের ভাবনা থেকে প্রেরণা নিয়েই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি এসেছে। ... গুরুদেবের ভাবনা থেকেই এই শিক্ষানীতি আনা হয়েছে—এটা আজকের শিক্ষাবিদদের বুঝতে হবে। গুরুদেব বলতেন, বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগান করা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়।'

যাদের সামনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই কথাগুলি বললেন তারা ভুল করেও প্রশ্ন করেননি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন লেখায় এ কথা বলেছেন। করলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছা খুলে যেত। যাদের সামনে এ কথা বলেছেন তারা কারা? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে ঢোকার সময় হল-ভরানো সেই শ্রোতাদের কণ্ঠে 'জয় রবীন্দ্রনাথ' ধ্বনি শোনা যায়নি। বরং শোনা গিয়েছে, 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি। এতেই বোঝা যায় শ্রোতারা রবীন্দ্র-অনুরাগী নন, একান্তই অমিত শাহ তথা বিজেপি-অনুরাগী!

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা সম্পর্কে অমিত শাহ সেদিন যা বলেছেন, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার আদৌ কোনও মিল নেই, বরং জাতীয় শিক্ষানীতির ছত্রে ছত্রে রয়েছে রবীন্দ্র ভাবনা-বিরোধী নানা পদক্ষেপ।

অতীতেই সকল ঐশ্বর্য— রবীন্দ্রনাথ এই বস্তাপচা ভাবনার বিরোধী

জাতীয় শিক্ষানীতির ভূমিকাতেই বলা হয়েছে, "প্রাচীন ও সনাতন ভারতীয় জ্ঞান ও বিচারে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের আলোকে এই নীতি তৈরি করা হয়েছে।" অর্থাৎ স্পষ্ট বলে দেওয়া হল— আধুনিক জ্ঞান ও বিচারের আলোকে এই শিক্ষানীতি তৈরি করা হয়নি। তা হলে এই শিক্ষানীতিকে প্রগতিশীল বলা যাবে কীভাবে?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষাবিধি' প্রবন্ধে বলেছেন, 'আমাদের সমাজ আমাদের কালের

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিজেপির পরাজয়
কর্ণাটক রাজ্য কমিটির বিবৃতি

কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির এই লজ্জাজনক পরাজয়, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাতের রাজনীতি, সীমাহীন দুর্নীতি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব প্রশমনে সরকারের ব্যর্থতা, মহিলাদের উপর নির্যাতন এবং শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র ও সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী সরকারি নীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। এস ইউ সি আই (সি)-এর কর্ণাটক রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড কে উমা ১৩ মে এক বিবৃতিতে বলেন, বিজেপিকে পরাজিত করার জন্য আমাদের দল এস ইউ সি আই (সি) জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

'অপারেশন কমল'-এর মাধ্যমে অনৈতিক ভাবে ক্ষমতা দখল করার পর থেকে বিজেপি চরম দুর্নীতি, উগ্র সাম্প্রদায়িকতায় উস্কানি ও ঘৃণার রাজনীতির পথ অনুসরণ করেছে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণের মতো জনগণের প্রকৃত সমস্যাগুলি বিজেপি শাসনে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। গোটা রাজ্য সরকারটিই আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। কেন্দ্রীয় সরকারও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে লাগাতার কৃষক ও

সাতের পাতায় দেখুন

ডাক্তারির ডিপ্লোমা কোর্স
প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

ডাক্তারির ডিপ্লোমা কোর্স ও ১৫ দিনের নার্সিং কোর্স সম্পর্কিত মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে এসইউসি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১২ মে বলেন, এই প্রস্তাব জনসাধারণের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে ছেলেখেলার নামান্তর। তিনি বলেন, ১১ মে নবান্নে যে প্রস্তাব দিয়েছেন আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করছি। এই ডিপ্লোমাধারী ডাক্তারদের

চারের পাতায় দেখুন

সল্টলেকে স্বাস্থ্যভবনের সামনে এআইডিএসও-র বিক্ষোভ। ১৫ মে

কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষে
বাসদ (মার্ক্সবাদী)-র সভা

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) -র উদ্যোগে ১১ মে ঢাকায় বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা। বক্তব্য রাখেন নির্বাহী ফোরামের সদস্য কমরেড জয়দীপ ভট্টাচার্য ও কমরেড শফিউদ্দিন কবির আবিদ।

সভায় বক্তারা বলেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা এ যুগে মানবমুক্তির হাতিয়ার। যুগ যুগ ধরে মানুষ শোষিত বঞ্চিত হয়ে আসছে। এই শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে মুক্তির লড়াইও চলেছে। কিন্তু বারবার এক শোষণমূলক ব্যবস্থার বদলে আর এক শোষণমূলক ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহান কার্ল মার্কস প্রথম শোষণের প্রকৃত কারণ উদঘাটন করে দেখান এবং সত্যিকারের মুক্তির পথ নির্দেশ করেন। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং-এর মতো মহান শিক্ষকেরা মার্কসবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে অমূল্য সংযোজন করেছেন।

সোভিয়েত সংশোধনবাদ ধীরে ধীরে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ডেকে আনে। আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ভারতবর্ষে শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির জন্য প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রাম শুরু করেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা ও রক্ষার সংগ্রামে তাঁর পথনির্দেশ এক অমূল্য সংযোজন। তিনি লেনিনীয় পার্টি মডেলকে আরও উন্নত করেন এবং এর ভিত্তিতে ভারতবর্ষের মাটিতে একমাত্র বিপ্লবী দল এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)

পাঁচের পাতায় দেখুন

রবীন্দ্রনাথ ঃ অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়ে গেলেন অমিত শাহ

একের পাতার পর

উপযোগী শিক্ষা আমাদিগকে দিতেছে না, আমাদিগকে দুই-চারি হাজার বৎসর পূর্বকালের শিক্ষা দিতেছে। অতএব মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে সকলের চেয়ে বড় যে বিদ্যালয়, সেটা আমাদের বন্ধ।' অন্য একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যে জাতি মনে করে বসে আছে যে অতীতের ভাণ্ডারের মধ্যেই তার সকল ঐশ্বর্য, সেই ঐশ্বর্যকে অর্জন করার জন্য তার স্বকীয় উদ্ভাবনার কোনও অপেক্ষা নেই, তা পূর্বযুগের ঋষিদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়ে চিরকালের মতো সংস্কৃত ভাষায় পুঁথির শ্লোকে সঞ্চিত হয়ে আছে, সে জাতির বুদ্ধির অবনতি হয়েছে, শক্তির অধঃপতন হয়েছে।... ...যে জাতি অতীতের মধ্যেই তার গৌরব স্থির করেছে, ইতিহাসে তার বিজয়যাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেছে, সে জাতি শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে কর্মে শক্তিহীন ও নিষ্ফল হয়ে গেছে।'

ভারতীয় নৈতিকতাকে যুগের প্রেক্ষিতে বুঝতে হবে

বিজেপির জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, 'জাতীয় শিক্ষানীতি এরকম একটি ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখে যার ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত থাকবে ভারতীয় নৈতিকতার উপর।' এই নৈতিকতা কথাটি সঠিকভাবে বোঝা উচিত। কারণ, কোনও যুগ বা কালের উল্লেখ না করে 'ভারতীয় নৈতিকতা' বলার কোনও অর্থই হয় না। অথচ 'ভারতীয় নৈতিকতা' বলে অমিত শাহর দল বাস্তবে প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী নৈতিকতাকেই ভারতীয় নৈতিকতা বলে চালাতে চাইছে। যেহেতু সাধারণ মানুষ দেশকে ভালোবাসেন, তাই দেশের নাম যুক্ত করে ভারতীয় নৈতিকতা বললে অনেকেই মনে করবেন, এতে আপত্তি কীসের? কিন্তু একটু খুঁটিয়ে বিচার করলেই ধরা পড়বে যে আধুনিক যুগে পিতৃ-প্রতিজ্ঞা রক্ষায় পুত্রের ১৪ বছর বনবাস, স্বামীর আদেশে স্ত্রীর অগ্নিপরীক্ষা, পাশা খেলায় স্ত্রীকে বাজি ধরা, 'নিম্নবর্ণে'র মানুষকে বেদ পড়তে না দেওয়া, জাতি-বর্ণ ভিত্তিক পেশা প্রভৃতি যে নৈতিকতার কথা ভারতীয় সাহিত্যে ও শাস্ত্রে রয়েছে সেগুলিই বিজেপি বর্ণিত 'ভারতীয় নৈতিকতা'। অথচ আমাদের দেশে নবজাগরণের কালে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র, শরৎচন্দ্র, নজরুল, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি মনীষীরা যে উন্নত ও গণতান্ত্রিক নৈতিকতার কথা বলে গিয়েছেন সেইটি তো আজকের দিনের ভারতীয় নৈতিকতা! এই নৈতিকতা বিজেপির পছন্দ নয়। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, '... একদিন আমাদের ইতিহাসের একটা বিশেষ অবস্থায় আমাদের সমাজ মানুষের কাহাকেও ব্রাহ্মণ, কাহাকেও ক্ষত্রিয়, কাহাকেও বৈশ্য বা শূদ্র হইতে বলিয়াছিল।... এখনও সে বলিতেছে, 'ব্রাহ্মণ হও, শূদ্র হও।' প্রাচীনপন্থাকে তীব্র কষাঘাত করে 'বিদ্যাসাগর' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, 'তিনি দেশাচারের দুর্গে আঘাত করেছিলেন।' বলেছেন, 'তিনি যা কিছু পাশ্চাত্য তাকে অশুচি বলে অপমান করেননি। তিনি জানতেন, বিদ্যার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের দিকবিরোধ নেই।' অথচ জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অমিত শাহরা পশ্চিমের জ্ঞানকে হয় উপেক্ষা করছেন, নতুবা সেই জ্ঞান বেদে ছিল বলে দাবি করে মিথ্যা গর্ব করছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সমস্ত রসদ পরিপূর্ণ উপভোগ করে আজ নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহরা পাশ্চাত্যবিদ্যার বিরুদ্ধে বিষোদগার করছেন। জাতীয় শিক্ষানীতিতে তার স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবিতকালে একদল লোকের মধ্যে এমন প্রবণতা দেখে লিখেছিলেন, 'একদিকে মোটর-রেল-টেলিগ্রাফকে জীবনযাত্রার নিত্যসহচর করেছি, আবার অন্যদিকে বলছি যে বিজ্ঞান আমাদের সর্বনাশ করল, পাশ্চাত্য বিদ্যা আমাদের সইবে না।'

মেকি সায়েন্সের মন্ত্রে অন্ধ কুসংস্কারের আবাহনের বিরোধী রবীন্দ্রনাথ

ভারতের জ্ঞান কী সে সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে 'ভারতের জ্ঞান-এর অন্তর্গত হল প্রাচীন ভারতের জ্ঞান এবং আধুনিক ভারতে তার অবদান।' এই প্রাচীন ভারতের জ্ঞানকেই ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা বা ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম বলা হচ্ছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ভারতের নবজাগরণের যুগের ও আধুনিক ভারতের শিল্প ও সাহিত্য সঙ্গীত কলা বিজ্ঞান দর্শন স্থাপত্য বিষয়ক জ্ঞানগুলিকে জাতীয় শিক্ষানীতিতে ভারতের জ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম-এর নামেই মোদিজি অমিত শাহরা গণিত জ্যোতির্বিদ্যা দর্শন অর্থনীতি স্থাপত্যবিদ্যা, ঔষধি কৃষিবিদ্যা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে পৌরাণিক যুগের কাল্পনিক কাহিনি ও নানা বিষয়ে জ্ঞান সম্পর্কে প্রাচীন ধারণাকেই তুলে ধরছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর যুগে এমন কয়েক জনকে পেয়েছিলেন, যাদের সাথে মোদি-অমিত শাহদের ভাবনার প্রবল মিল রয়েছে।

তাই নরেন্দ্র মোদিকে বলতে শোনা গিয়েছে, প্রাচীন ভারতে প্লাস্টিক সার্জারি ছিল। যদি না থাকে তা হলে গণেশের ঘাড়ে হাতির মাথা জুড়লো কেমন করে? প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক খোদ সংসদে বললেন, জ্যোতিষশাস্ত্রের কাছে আধুনিক বিজ্ঞান তো শিশু! তাদেরই আরেক নেতা পূর্বতন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যপাল সিং গর্বে বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন 'ডারউইনের তত্ত্ব ভুল। কারণ, কেউ কখনও কোনও বানরকে লেজ খসে মানুষ হতে দেখেনি।' তাকে ভুল ধরিয়ে দেওয়ার পরেও তিনি গর্ব করে বলেছিলেন, 'আমি সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়েছি।' বিজ্ঞান সম্পর্কে যাদের জ্ঞানের বহর এমন সেই মন্ত্রীরাই কিন্তু তাদের মন্ত্রিসভায় জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছেন। সম্ভবত এদের সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'সায়েন্সে ডিগ্রিধারী পন্ডিত এ দেশে বিস্তর আছে, যাদের মনের মধ্যে সায়েন্সের জমিনটা তলতলে। তাড়াতাড়ি যা—তা বিশ্বাস করতে তাদের অসাধারণ আগ্রহ। মেকি সায়েন্সের মন্ত্র পড়িয়ে অন্ধসংস্কারকে তারা সায়েন্সের জাতে তুলতে কুণ্ঠিত হয় না।' রবীন্দ্রনাথের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা থাকলে অমিত শাহদের ভণ্ডামির তীব্র নিন্দা না করে কেউ পারবে?

যাদের মাতৃভাষার লিপি নেই তারা শিখবে কোন ভাষায়

অমিত শাহ সেদিন মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িয়ে নিজের মতো করে বেশ কিছু কথা বলেছেন। আমরা সকলেই জানি রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চেয়েছিলেন। কিন্তু যাদের মাতৃভাষার লিপি নেই, পুস্তক নেই, তাদের কীভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হবে? তাদের কি উন্নত জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জন্য কোনও উন্নত ভাষা শেখার ব্যবস্থা থাকবে না? সেই ভাষাটি কি সমস্ত দিক থেকে বিশ্বের জ্ঞানের আলো প্রবেশের পথ খুলে দেবে —এমন একটি ভাষা হবে না? যদি তা হয় তাহলে নিশ্চিত ভাবে সেই ভাষাটি হওয়া উচিত ইংরেজি ভাষা। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ও বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গা-যমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।' এ প্রসঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতি ঠিক উল্টো কথাটি বলেছে। জাতীয় শিক্ষানীতির ৪.১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "পরিবারের কথিত ভাষাই হচ্ছে মাতৃভাষা অর্থাৎ সেই ভাষা যে ভাষায় কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের লোক কথা বলে। ... ...যেখানে গৃহে ব্যবহৃত ভাষা বা মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক লভ্য নয় সেই সব ক্ষেত্রেও শিক্ষাদানের মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।" এসব কথাই অমিত শাহরা আজ রবীন্দ্রনাথের ভাবনা বলে চালিয়ে দিতে চাইছেন।

অনলাইন নয়— রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তা ছাত্রশিক্ষক সম্পর্কের ভিত্তিতে

সকলেই জানেন, মোদিজির জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষাকে অনলাইন নির্ভর করে তোলার প্রবল প্রচেষ্টা রয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে কোনও সম্পর্ক থাকবে না। জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণের নাম করে ইউজিসি 'ব্লেন্ডেড মোড' চালুর যে নির্দেশনামা জারি করেছেন তাতে বলা হয়েছে, অন্তত পক্ষে ৪০ শতাংশ পঠনপাঠন অনলাইনে হবে যা সর্বোচ্চ ৭০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। শুধু তাই নয়, সেই নির্দেশনামায় অনলাইন শিক্ষা 'সিংক্রোনাস' বা 'অ্যাসিংক্রোনাস' করার কথাও বলা হয়েছে, যেখানে 'অ্যাসিংক্রোনাস' ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের মধ্যে কোনও রকম যোগাযোগ বা সম্পর্ক তৈরি হবে না। অর্থাৎ শিক্ষকের লেকচার ভিডিও করে আপলোড করে দেওয়া হবে এবং শিক্ষার্থী সময় সুযোগ মতো তা শুনে বা দেখে নেবে। এটা মোদিজির ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের ভাবনাটা এর ঠিক বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বিদ্যা যে দেবে এবং বিদ্যা যে নেবে তাদের উভয়ের মাঝখানে যে সেতু সেই সেতুটি হচ্ছে ভক্তি-স্নেহের সম্বন্ধ। সেই আত্মীয়তার সম্বন্ধনা থেকে যদি কেবল শুষ্ক কর্তব্য বা ব্যবসায়ের সম্বন্ধই থাকে তাহলে যারা পায় তারা হতভাগ্য, যারা দেয় তারাও হতভাগ্য।' তিনি আরও বলেছেন, 'মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া ওঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চরিত হইয়া থাকে। ... গুরু শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষা কার্য সজীব দেহের শোণিত স্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে।'

'এক দেশ এক শিক্ষা' এ হেন ছাঁচে ঢালা চিন্তার বিরোধী রবীন্দ্রনাথ

নরেন্দ্র মোদি যে শিক্ষানীতি দেশ জুড়ে রূপায়ণ করবার জন্য কোমর বেঁধে নেমেছেন তাতে জাতীয় গৌরবের নামে সারা দেশে এক প্রশাসনিক কর্তৃত্ব, এক ভাষা, এক প্রবেশিকা পরীক্ষা, এক শিক্ষা কাঠামো, এক সিলেবাসের কথা বলা হয়েছে, যেখানে ভারতবর্ষের মতো এমন সুবিশাল বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক পরিবেশে শিক্ষায় বৈচিত্র্যের কোনও স্থান নেই। বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষের শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা যা ছিল অমিত শাহরা তার বিপরীতে পথে চলছে। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধেকবিগুরু লিখেছেন, 'রাষ্ট্রীয় গণ্ডি-দেবতার যারা পূজারী, তারা শিক্ষার ভেতর দিয়া নানা ছুতোয় জাতীয় আত্মম্ভরিতার চর্চা করাকে কর্তব্য মনে করে। জার্মানি একদা শিক্ষাব্যবস্থাকে তার রাষ্ট্রনৈতিক ভেদবুদ্ধির ক্রীতদাসী করেছিল বলে পশ্চিমের অন্যান্য নেশন তার নিন্দা করেছে।... স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তি দান করার শিক্ষাই আজকের দিনে প্রধান শিক্ষা।' 'শিক্ষাবিধি' প্রবন্ধটি পড়লে অমিত শাহ বুঝতেন, চালাকি করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি ধরা পড়ে গিয়েছেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'দেশের সমস্ত শিক্ষাবিধিকে সে এক ছাঁচে শক্ত করিয়া জমাইয়া দিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চেষ্টা।...দেশের মনঃপ্রকৃতিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া সে আপনার আইন খাটাইবে, ইহাই তাহার মতলব।' স্বৈরাচারী শাসকদের মতলব কী হতে পারে তা বুঝেএ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জনগণের কর্তব্যও নির্ধারণ করে দিয়ে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'যেমন করিয়া হউক, আমাদের দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীর মুক্ত করিতেই হইবে।...সেই শক্তিকে ও উদ্যমকে সফলতার পথে প্রবাহিত করিয়া স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমাদের নিজেকে লইতে হইবে। দেশের কাজে যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিতে চান এইটেই তাঁহাদের সবচেয়ে প্রধান কাজ।

... 'জাতীয়' নামের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া আমরা কোনও একটা বিশেষ শিক্ষাবিধিকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিতে পারি না। যে শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার দ্বারা নানাভাবে চালিত হইতেছে, তাহাকেই 'জাতীয়' বলিতে পারি। স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক, আর বিজাতীয়ের শাসনেই হউক, যখন কোনও-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা কোনও ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায়, তখন তাহাকে 'জাতীয়' বলিতে পারিব না। তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।'

এরপরেও কি বুঝতে অসুবিধা হয় যে, অমিত শাহদের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ নন, তা হল বিজেপি আর এস এসের সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি আর একচেটিয়া পুঁজি মালিকদের টাকার থলি, যারা শিক্ষার সর্বনাশ করে শিক্ষার পূর্ণ ব্যবসায়ীকরণ চাইছে।

দিল্লি ও মহারাষ্ট্র, দুই ক্ষেত্রেই বিজেপির ভূমিকা ছিল বেআইনি

একই দিনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রথম রায়টি দিল্লির আপ সরকার এবং উপরাজ্যপালের ক্ষমতার এক্তিয়ার নিয়ে। মামলাটি চলেছে আট বছর ধরে। অথচ সংবিধানে একটি নির্বাচিত সরকারের এক্তিয়ার কী, রাজ্যপালের এক্তিয়ারই বা কী, তা নির্দিষ্ট। সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ সর্বসম্মত ভাবে জানিয়েছে, যাবতীয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দিল্লির নির্বাচিত সরকারের। পুলিশ, আইনশৃঙ্খলা ও ভূমি দফতর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার কেন্দ্রের। প্রশ্ন ওঠে, ক্ষমতার এই বিভাজনের জন্য আট বছর অপেক্ষা করার কিংবা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন হল কেন?

গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ থাকলে শুরুতেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নির্বাচিত সরকারের অধিকারগুলিকে মান্যতা দিতে দ্বিধা করত না। পরিবর্তে দিল্লির উপরাজ্যপাল এতদিন সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে একের পর এক সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের উপর চাপিয়ে এসেছেন গায়ের জোরে, যা আসলে পিছনে থাকা কেন্দ্রীয় সরকারেরই জোর। ভোটে নির্বাচিত একটি সরকারকে যে ভাবে এমনকি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলির জন্যও পদে পদে উপরাজ্যপালের দ্বারস্থ হতে হচ্ছিল তা যে পুরোপুরি বেআইনি, তা বুঝতে সংবিধান বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার পড়ে না। সুপ্রিম কোর্ট উপরাজ্যপালের এই সব আচরণকেই অগণতান্ত্রিক এবং বেআইনি বলেছে। বলেছে, উপরাজ্যপাল কখনওই দিল্লি সরকারের সাংবিধানিক সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। অথচ তিনি এতদিন ধরে পাইকারি হারে তা করে গিয়েছেন। উপরাজ্যপালের ভাবটি হল, যা কিছু বিজেপির স্বার্থ রক্ষা করবে তিনি তা-ই করবেন, আইন বা গণতন্ত্রের ধার ধারবেন না। দেরিতে হলেও শীর্ষ আদালত উপরাজ্যপালের এক্তিয়ারের সীমাটি স্পষ্ট করে দিয়েছে। যদিও এই সীমা বাস্তবে বিজেপি নেতাদের অজানা ছিল না। সব কিছু জেনেই তাঁরা এই অগণতান্ত্রিক আচরণ চালিয়ে গেছেন।

দ্বিতীয় রায়টি মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালের এক্তিয়ার সংক্রান্ত। সুপ্রিম কোর্ট দেখিয়েছে, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন রাজ্যপালও পদে পদে তাঁর এক্তিয়ার লঙ্ঘন করেছেন— আইন ভেঙেছেন, সরকার ভেঙেছেন, গণতন্ত্রকে পদদলিত করেছেন। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বে বেশ কিছু শিবসেনা বিধায়কের 'বিদ্রোহে'র পরেই বিজেপি বিধায়ক দেবেন্দ্র ফড়নবীসের অভিযোগের ভিত্তিতে মহারাষ্ট্রের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের নির্দেশ দিয়ে প্রাক্তন রাজ্যপাল ভগত সিংহ কোশিয়ারি আইনমাফিক কাজ করেননি। কারণ, শিন্ডে গোষ্ঠী সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেনি, তাই উদ্ধব সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে বলে মনে করার কোনও কারণ রাজ্যপালের সামনে ছিল না। শীর্ষ আদালত এই ঘটনাকে রাজ্যপালের রাজনীতিতে নাক গলানো বলে সতর্ক করে দিয়েছে যে, সংবিধান বা আইন কোনওটাই রাজ্যপালকে সরাসরি রাজনীতির ময়দানে নেমে পড়ার অনুমোদন দেয় না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বা অন্তর্দলীয় বিবাদে নাক গলানোর অধিকারও যে রাজ্যপালের নেই, তা-ও স্পষ্ট করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। অথচ মহারাষ্ট্রের তৎকালীন রাজ্যপাল কোশিয়ারি বিজেপির শীর্ষ নেতাদের নির্দেশে বেআইনি এবং এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজগুলিই একের পর এক করে গিয়েছেন।

উপরোক্ত দুটি রায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং তার নিয়ন্ত্রিত রাজ্যপালদের চরম অগণতান্ত্রিক চরিত্রটিকেই আরও একবার প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে। দীর্ঘ কংগ্রেস শাসনেও বিরোধী সরকারগুলিকে নাস্তানাবুদ করতে রাজ্যপালদের এমন করেই নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়েছে। আজ যখন শাসকের বিরুদ্ধে রায় দিতে অনেক বিচারকেরই হাত কাঁপে, তখন এই দুই রায় নিশ্চয় উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বাস্তবিকই, বাদী কে, বিবাদী কে, এগুলি যে বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত নয়, অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণই যে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত— এটা বিচারব্যবস্থার গোড়ার কথা। নিরপেক্ষ বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বহু যুগ ধরে এই ধারণা চালু রয়েছে যে, হাকিম নড়তে পারে, কিন্তু হুকুম নড়তে পারে না। বাস্তবে হাকিম আর হুকুম দুই-ই ইদানিং যে হারে নড়ে চলেছে তা বিচারব্যবস্থার উপর শাসক দলের প্রভাব এবং চাপকেই প্রকট করে তুলেছে এবং বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়েও জনমনে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। একের পর এক মামলায় দেখা যাচ্ছে, হাকিম নড়লেই হুকুম শুধু নড়ছেই না, রীতিমতো উল্টোপথে হাঁটতে শুরু করছে। ফলে এমনকি ধর্ষক, খুনিরাও হাসতে হাসতে জেল থেকে বেরিয়ে আসছে। অন্য দিকে নির্দোষরা কখনও দেশদ্রোহের অভিযোগে, কখনও অন্য কোনও কল্পিত অভিযোগে জেলে পচছে। মনে পড়ে যায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ন'বারের বিধায়ক, জননেতা প্রবোধ পুরকায়েতের বিরুদ্ধে খুনের মামলার কথা। নিম্ন আদালত তাঁকে বেকসুর ঘোষণা করে। রাজ্যে তখন সিপিএম শাসন। ঘটনার ২০ বছর পর হঠাৎই হাইকোর্টে মামলাটি ওঠে। তিনি কোনও রকম আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগই পাননি। তাঁর যাবজ্জীবন সাজা হয়ে যায়। এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গেলে বিচারক কোনও কাগজপত্র না দেখে মামলার নাম শুনেই বলেন, বিধায়ক হলে কি খুন করার অধিকার পাওয়া যায় নাকি? ফলে রায় অপরিবর্তিতই থেকে যায়। বিনা দোষে তিনি ১৭ বছর জেলে কাটাতে বাধ্য হন।

স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মনে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে যে, তা হলে আইনের নিরপেক্ষতার যে কথা বলা হয় তা কি ব্যক্তি-বিচারকের ভূমিকার উপরই কেবল নির্ভরশীল? এক একজন বিচারক কি তাঁদের নিজেদের মতো করে আইনের ব্যাখ্যা করবেন? অনেকেরই প্রশ্ন, এই দুটি মামলায় যদি অন্য বিচারপতি থাকতেন, তা হলেও কি একই রায় হত? আইন যদি সত্যকে প্রতিফলিত করে, তবে তা বিশেষ বিচারকের শাসকের প্রতি ভয় থাকা, না-থাকার দ্বারা প্রভাবিত হবে কেন? 'আইন আইনের পথে চলবে' এটা কি তা হলে কথার কথা?

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ 'বিচারবিভাগ' এই একচেটিয়া পুঁজির কর্তৃত্বের যুগে কতটা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকতে পারে, তার সামনে রয়েছে বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। কিন্তু বিজেপি সরকার যখন আজ নানা অছিলায় গোটা বিচারব্যবস্থাকেই মুঠোয় পুরতে চাইছে, বিচার ব্যবস্থার মধ্যে কোনও বিরোধী স্বর বরদাস্ত করতে রাজি হচ্ছে না, সেই পরিস্থিতিতে এই দুই রায় অবশ্যই দৃষ্টান্তস্বরূপ।

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে ক্রমশ নামছে কেন ভারত

সারা বিশ্বে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান হয়েছে ১৬১ নম্বরে। 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স' নামে একটি সংস্থার সূচকে সারা বিশ্বের সংবাদমাধ্যমের মধ্যে ২০২০তে ভারত ছিল ১৪২ নম্বরে, ২০২২-এ ছিল ১৫০ নম্বরে এবং ২০২৩-এ এগারো ধাপ নেমে এসে দাঁড়িয়েছে ১৬১ নম্বরে। এতে অন্য দেশের কাছে তথাকথিত বৃহত্তম গণতন্ত্রের আসল চেহারাটা পরিষ্কার হলেও এ দেশের মানুষের কাছে এটা নতুন কোনও বিষয় নয়। ২০১৪ সালে মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে সর্বত্র স্বাধীন চিন্তার ওপর আক্রমণের অঙ্গ হিসেবেই সংবাদমাধ্যমের উপর আক্রমণও বেড়েছে। সংবাদমাধ্যমে কর্পোরেট পুঁজির মালিকানা বেড়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই বৃহৎ পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমে শাসক শ্রেণির দুর্নীতি, অনৈতিকতা, অগণতান্ত্রিক কাজকর্মের বিরোধিতা, সমালোচনা প্রায় নেই বললেই চলে, আছে মোদি ভজনার রমরমা। শাসকের কোলে বসে থাকা সংবাদমাধ্যম সম্পর্কে 'গোদি মিডিয়া' কথাটি এখন খুবই চালু যেখানে প্রায় বাদ চলে গিয়েছে জনস্বার্থের বিষয়টি। অথচ গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে আইনসভা, সরকার এবং বিচারবিভাগের ভূমিকার মূল্যায়ন ও ত্রুটি চিহ্নিত করা সংবাদমাধ্যমের অন্যতম কাজ। ফলত আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের স্থান দ্রুত নামছে।

১৯৭৫-৭৬ সালে জরুরি অবস্থার সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সমালোচক সাংবাদিকদের 'মিসা' আইনে বিনা বিচারে বন্দি করেছিলেন। বিজেপি আমলে এই সাংবাদিক নিপীড়ন আরও বহুগুণ বেড়েছে। একদিকে সরকার ঘনিষ্ঠ একচেটিয়া পুঁজিমালিকরা দেশের অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমকে কিনে নিয়ে তাদের মোদি ভজনায় বাধ্য করছে এবং অপরদিকে যারা নিজেদের বিক্রি করতে রাজি হচ্ছেন না তাদের নানা ভাবে প্রশাসনিক হয়রানি, গ্রেপ্তার এমনকি ভাড়াটে খুনি লাগিয়ে খুন পর্যন্ত করে দেওয়া হচ্ছে। ২০১৪ থেকে ২০২০ এই ছ'বছরের মধ্যেই প্রখ্যাত সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ, রাজদেব রঞ্জন সহ মোট কুড়ি জন সাংবাদিক বিজেপি প্রভাবিত কিছু ধর্মান্ধ এবং মাফিয়াদের আক্রমণে নিহত হয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। সিদ্দিক কাপ্পান সহ বহু সাংবাদিককে বিনা বিচারে মিথ্যা মামলায় দিনের পর দিন আটক থাকতে হয়েছে এবং হচ্ছে। বস্তুত বর্তমানে পৃথিবীর সর্বাধিক জনবহুল দেশ ভারতের বিশাল আর্থিক বাজারকে দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির অবাধ মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করতে বিজেপি সরকার এতটাই বদ্ধপরিকর যে, এর পথে কোনও রকম প্রতিবাদ-প্রতিরোধই যাতে জনসাধারণ করতে না পারে সে জন্য গোটা দেশে এক অলিখিত প্রশাসনিক সন্ত্রাসের রাজত্ব তারা কায়েম করতে চাইছে। বুঝিয়ে দিতে চাইছে, বিজেপি সরকারের বিরোধিতা কোনও মতেই বরদাস্ত করা হবে না। সমাজে কারও যত পরিচিতি বা প্রতিষ্ঠাই থাকনা কেন, সরকারের বিরোধিতা করলেই যে কোনও অজুহাতে তাঁকে কারারুদ্ধ বা হত্যা করা হবে। এই আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যই তারা প্রতিনিয়ত নানা অজুহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, দলিত, সাধারণ নাগরিকের ওপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে এবং সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার ভিত্তিতে দেশে চরম স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করতে চাইছে। সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করা তারই অঙ্গমাত্র। সংবাদমাধ্যমের তথ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি সত্যনিষ্ঠ হলে দেশের জনসাধারণকে তা ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করে। জনসমাজের মধ্যে যুক্তি-বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনার শক্তিকে ধ্বংস করে যুক্তিহীন উন্মাদনা সৃষ্টি করতে স্বৈরাচারী শাসকরা তাই এই সংবাদমাধ্যমকে কিনে নিতে চায় অথবা তার কণ্ঠরোধ করতে চায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিতে ফ্যাসিস্ট হিটলার ও একইভাবে সাংবাদিকদের কারারুদ্ধ এবং হত্যা করেছিলেন।

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদ করা যেমন যে কোনও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কর্তব্য, আবার সাংবাদিক সমাজকেও মনে রাখতে হবে, গোটা সমাজ জুড়ে স্বাধীন চিন্তা, যুক্তিনিষ্ঠ মনন যখন আক্রান্ত, তার সোচ্চার বিরোধিতা না করে আলাদা করে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। এ কথা ঠিক, অনেক সংবাদমাধ্যমেই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ধর্মীয় উন্মাদনা এবং প্রশাসনিক সন্ত্রাসের সমালোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু শুধু নিবন্ধ লিখে বা টিভিতে বিতর্ক করে এই আক্রমণকে প্রতিরোধ করা যাবে না।

এ দেশে সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করা শুরু কংগ্রেসি আমলে এবং আজ যদি বিজেপি হেরে গিয়ে কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় আসে তবে তারাও পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষার জন্য একই পথে চলবে। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার বিরুদ্ধে চাই সর্বস্তরের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলন।

ন্যায্য দাবিতে মিছিল বা ধর্মঘট হলে আন্দোলনের দাবিগুলো ন্যায়সঙ্গত কি না, জনগণের সমর্থন আছে কি না— সে সব তুলে ধরার পরিবর্তে একাংশের সংবাদমাধ্যম ব্যস্ত হয়ে পড়ে এর ফলে কত যানজট হল বা কত উৎপাদন নষ্ট হল তার প্রচারে। মনে রাখা দরকার, এ ধরনের উদ্দেশ্যমূলক প্রচার সমাজে আন্দোলনবিরোধী, প্রতিবাদবিমুখ মানসিকতার প্রসারেই সাহায্য করে। আর তাতেই স্বৈরাচারী শাসকের সুবিধে। সংবাদমাধ্যম নিজেদের স্বাধীনতা চাইলে সমস্তরকম ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সাংবাদিকদের নিজেদের একাত্মবোধও অত্যন্ত জরুরি।

জঞ্জাল-ফি চাপানোর প্রতিবাদে বরানগর পৌরসভায় ডেপুটেশন

আবর্জনা সংগ্রহের জন্য ফি চাপানো ও ব্যাপক হারে ট্রেড লাইসেন্স ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে ১২ মে বরানগর পৌরসভায় এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন হয়।

সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, বরানগর পৌরসভা বাড়ি থেকে জঞ্জাল সংগ্রহের জন্য পরিবারপিছু মাসিক ২০ টাকা ফি বরাদ্দ করতে চলেছে, যা জঞ্জাল কর চাপানোর সামিল। অথচ পুরসভা যে ট্যাক্স সংগ্রহ করে তা থেকেই এই পরিষেবা পাওয়া মানুষের অধিকার। উপ-পৌরপ্রধানের বক্তব্য অনুযায়ী, কিছু মানুষ সঠিক স্থানে বর্জ্য ফেলছেন না, পৌরসভার নির্দেশ মানছেন না, কিন্তু ফাইন ধার্য করলে নিয়ম মানবে। অথচ যখন কেউ নিয়ম ভাঙে তখন নিয়মভঙ্গকারীকে সামান্য জরিমানা করা হয় তাকে সচেতন করার লক্ষ্যে। কিন্তু কিছু নিয়মভঙ্গকারীর জন্য সকলের উপর তার দায়ভার চাপানোর ভাবনা কেন? এ ছাড়া, নোটবন্দি ও করোনা পরিস্থিতির ফলে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বরানগরের ক্ষুদ্র-মাঝারি ব্যবসায়ীদের উপর প্রায় ২০০-২৪০ শতাংশ ট্রেড লাইসেন্স ফি বাড়ানো হয়েছে। এই ভাবে জনগণের উপর নানা আর্থিক বোঝা চাপানো হচ্ছে।

বিক্ষোভ সভায় আঞ্চলিক সম্পাদক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আমরা পৌরসভার এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করছি। কমরেডস বাণী সিনহা ও গৌর দাসের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল চেয়ারপার্সনের কাছে দাবিপত্র দেন। ট্রেড লাইসেন্সের ওপর ২০০ শতাংশ ফি বাড়ানো নিয়ে চেয়ারপার্সন নীরব থাকলেও জঞ্জাল করের বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করব এবং সর্বদলীয় মিটিং ডাকব।

চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালুর বিরোধিতা ডিএসও-র

জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ মেনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া বনমালী কলেজে স্নাতক স্তরে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালুর চেষ্টা করছে কর্তৃপক্ষ। এর বিরুদ্ধে ১৩ মে এআইডিএসও-র উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল হয় এবং অধ্যক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। আন্দোলন চলাকালীন টিএমসিপি-র গুন্ডাবাহিনী এআইডিএসও কর্মীদের উপর আক্রমণ চালায়। মহিলা কর্মীরাও রেহাই পাননি। সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলার আহ্বায়ক নিরুপমা বক্সী আক্রান্ত হন।

কলেজ কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর প্রামাণিক ও সম্পাদিকা রূপসোনা খাতুন বলেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

রাধিকাপুর এক্সপ্রেসে জেনারেল বগি বাড়ানোর দাবিতে ডিআরএম ডেপুটেশন

উত্তর দিনাজপুরের রাধিকাপুর থেকে কলকাতাগামী রাধিকাপুর এক্সপ্রেসে তিনটি জেনারেল বগি কমিয়ে দেওয়ার ফলে যাত্রীরা খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন। এর প্রতিবাদে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের পক্ষ থেকে ১ মে বিক্ষোভ মিছিল করে রায়গঞ্জ স্টেশন ম্যানেজারের মাধ্যমে কাটিহার ডিভিশন ডিআরএম-এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের আহ্বায়ক তপন বর্মন, গোবিন্দ পাল ও গোপাল দেবনাথ।

১৫ দিনের নার্সিং ও ডাক্তারিতে ডিপ্লোমা কোর্সের প্রস্তাব
তীব্র প্রতিবাদ এম এস সি-র

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র ১১ মে এক বিবৃতিতে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আবারও ১৫ দিনের নার্স এবং ডাক্তারির ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার প্রস্তাব দিয়েছেন এবং সেই সমস্ত ডিপ্লোমাধারী ডাক্তারদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে কাজে লাগানোর কথা বলেছেন। আমরা এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করছি।

কলকাতা মেডিকেল কলেজে এমএসসি ও নার্সেস ইউনিটির বিক্ষোভ ১২ মে

অনেক বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনার পর এবং ভোর কমিটির সুপারিশে ভারতে একজন এমবিবিএস ডাক্তার হতে ন্যূনতম সময় ধার্য হয়েছে সাড়ে পাঁচ বছর এবং তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ কোর্স সম্পন্ন করতে অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী অবিবেচকের মতো অবৈজ্ঞানিকভাবে যে ডিপ্লোমা চিকিৎসকের প্রস্তাব দিলেন তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং গ্রামীণ মানুষদের স্বাস্থ্য থেকে বঞ্চিত করবে। এর সাথে ১৫ দিনের নার্সিং চালু করার ভ্রান্ত নীতিরও আমরা বিরোধিতা করছি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার প্রবর্তিত স্বাস্থ্য-শিক্ষা বিষয়ক সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন গ্রামের মানুষের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের পরিবর্তে বিএসসি নার্সদের দিয়ে কমিউনিটি হেলথ অফিসার পোস্টে নিয়োগ করে ডাক্তারের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে গ্রামীণ মানুষের সাথে প্রতারণা করছে এবং রাজ্যের তৃণমূল সরকার তা পুরোপুরি কার্যকর করেছে। আমরা এরও প্রতিবাদ করছি।

তিনি বলেন, এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে ডাক্তারিতে প্রায় ৪০০০ আসন আছে। পাস করার পরেও অনেকে জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হতে পারছেন না। সাম্প্রতিক হিসাব বলছে, সরকারি চাকরিতে নিয়োগে প্রয়োজনীয় ডাক্তারের থেকে আবেদনকারী ডাক্তারের সংখ্যা বেশি। ফলে এমবিবিএস পাশ করা ডাক্তাররা গ্রামে বা সরকারি চাকরিতে যেতে চান না— এই সরকারি প্রচার একেবারেই সত্য নয়। আসলে স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সরকারি পরিকাঠামোর অভাব এবং প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ না করার অভিসন্ধিই এই প্রস্তাবে স্পষ্ট।

উল্লেখ্য 'বেয়ার ফুটেড ডক্টর' নামে আশির দশকে সিপিএম সরকার, ২০০৮-২০০৯ সালে কেন্দ্রে কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার ও রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার নানা নামে নানা অছিলায় ডাক্তারিতে সাড়ে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ডাক্তারি ছাত্র, চিকিৎসক সমাজ সহ সর্বস্তরের মানুষের আন্দোলনের চাপে সেই অবৈজ্ঞানিক বিল বাতিল করতে বাধ্য হয়।

এই অবস্থায় রাজ্য সরকারের এই ভ্রান্তনীতির প্রতিবাদে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার বৃহত্তর জনস্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার করছে ও অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবিত নীতি প্রত্যাহার করার দাবি জানাচ্ছে।

সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের প্রতিবাদ

'মুখ্যমন্ত্রীর তিন বছরের ডিপ্লোমা ডাক্তার তৈরির মধ্য দিয়ে যা ঘটবে তা হল, নেতা-মন্ত্রী-পয়সাওয়ালাদের জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আর গরিব মানুষের চিকিৎসার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণির ডিপ্লোমা ডাক্তার। এটা মানা যায় না।' এ কথা বলেন, সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে সিভিক পুলিশ, প্যারা টিচারের মতো তিন বছরের ডিপ্লোমা ডাক্তার তৈরির যে প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন তা নিন্দনীয়। অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের মতো সস্তার শ্রমিক বানাবার চেষ্টা ডাক্তার তৈরির ক্ষেত্রেও করতে চাইলে হিতে বিপরীত হবে। ডাক্তার তৈরির ক্ষেত্রে ন্যূনতম যে আন্তর্জাতিক মান তা যদি বজায় না রাখা হয় তার পরিণাম ভয়ানক হতে পারে। আমাদের রাজ্যে এবং দেশে এমবিবিএস পাশ করা চিকিৎসকের অভাব নেই। চিকিৎসকের ঘাটতি আছে সরকারি ক্ষেত্রে। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে সরকারি ক্ষেত্রে তারা আগে ঘাটতি পূরণ করুক। তিনি বলেন, চিকিৎসক সমাজ এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সিভিক পুলিশের মতো ডিপ্লোমা ডাক্তার তৈরির সিদ্ধান্ত মেনে নেবে না।

তীব্র প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

একের পাতার পর

দিয়ে রাজ্য সরকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনা করতে চাইছে। ভোর কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এমবিবিএস ডাক্তার হতে ন্যূনতম সাড়ে ৫ বছর লাগে। অন্য দিকে সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী সরকারি চিকিৎসকের চাকরিতে নিয়োগে পদের থেকে আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি। এই প্রেক্ষিতে ডিপ্লোমা ডাক্তার তৈরি করে তাঁদের দিয়ে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালাবার পরিকল্পনা সমর্থনযোগ্য নয়। এই প্রচেষ্টা জনসাধারণের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে ছেলেখেলার নামান্তর।

১৫ দিনের নার্সিং কোর্সের মাধ্যমে নার্স তৈরির পরিকল্পনা একই রকমভাবে জনস্বার্থ বিরোধী এবং নার্সিং পেশার অবমাননা। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কমিউনিটি হেলথ অফিসার পদে ডাক্তারের পরিবর্তে বিএসসি নার্স নিয়োগ করে গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকারের সঙ্গে যে প্রতারণা করছে তৃণমূল সরকারের এই নীতি তারই অনুসারী।

উল্লেখ্য, পূর্বতন সিপিএম সরকারও সাড়ে তিন বছরের ডিপ্লোমা ডাক্তার দিয়ে 'খালি পদ ডাক্তার' সৃষ্টি করতে চেয়েছিল— প্রবল প্রতিবাদের মুখে যা তারা কার্যকর করতে পারেনি। তৃণমূল সরকারও সেই পথেই হাঁটছে। আমরা এই প্রস্তাব অবিলম্বে প্রত্যাহারে দাবি জানাচ্ছি।

বাসদ (মার্ক্সবাদী)-র সভা

একের পাতার পর

প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই দেখান, এ যুগে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতির পথে অন্যতম অন্তরায় নিকৃষ্ট ব্যক্তিবাদ। যারা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে চায় অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে চায় তাদের এই মার্কসবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে যে সংযোজন করেছেন তা শুধু ভারতেই নয়, আজকের সময়ে সর্বত্র প্রযোজ্য। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতেই বাংলাদেশে শ্রমিক শ্রেণির একটি প্রকৃত বিপ্লবী দল গড়ে তোলার সংগ্রাম এ দেশে শুরু করেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। তিনি আজ প্রয়াত।

বক্তব্য রাখছেন বাসদ (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা

ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রকৃত কমিউনিস্ট চরিত্র গড়ে তুলতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ফ্যাসিবাদের নতুন রূপ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা সহ মার্ক্সবাদী জ্ঞানভাণ্ডারের বিভিন্ন দিকে অমূল্য সংযোজন করেছেন। বক্তারা আরও বলেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভারতের মাটিতে বিশেষীকৃত করার সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় কমরেড শিবদাস ঘোষ কিন্তু তাঁর দেখানো পথে আমরা আজও সেই সংগ্রাম জারি রেখেছি।

সভায় বক্তারা শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় সকল প্রকার ব্যক্তিবাদ-সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে লড়াই করে আগামী দিনে দলকে বিকশিত করার ও বামপন্থী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। 'আন্তর্জাতিক' পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

'রবীন্দ্রনাথ ঃ নানা আঙ্গিকে— পর্বান্তরে' প্রকাশিত

৯ মে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীতে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সারা বাংলা সার্ধশত রবীন্দ্র জন্মবর্ষ উদযাপন কমিটির উদ্যোগে প্রকাশিত হল প্রবন্ধ সংকলন 'রবীন্দ্রনাথ ঃ নানা আঙ্গিকে— পর্বান্তরে'। গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপিকা রঙ্গনা ব্যানার্জি। উপস্থিত ছিলেন কমিটির সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ গার্গী দাস বক্সী, বিশিষ্ট চিকিৎসক কিসান প্রধান ও তরুণ মণ্ডল, অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মহুয়া রায়, অহনা সেন। আবৃত্তি পরিবেশন করেন অনুশ্রী নস্কর। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কমিটির কোষাধ্যক্ষ ডাঃ অশোক সামন্ত।

অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কিছু ভাবনা সংবলিত একটি ফোল্ডার প্রকাশ করে চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, রবীন্দ্রনাথ যে ভারত চেয়েছিলেন সে ভারতকে আমরা পাইনি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে আজ যে পরস্পর বিচ্ছেদ ও বিদ্রোহ উত্তাল হয়ে উঠেছে, যদি দেখতেম, এর সহজ নিষ্কৃতি আছে তবে চুপ করেই থাকতেম। কিন্তু তার মূল প্রবেশ করেছে গভীরে, সহজে এর সমাধান হবে না। ...এখন চুপ করে থাকবার সময় নয়। আমাদের ভাবতে হবে, বড়ো করে ভাবতে হবে— ভাবাবিষ্ট আর্দ্রচিত্তে নয়, বুদ্ধিপূর্বক চিন্তা করে। দেশের সম্বন্ধে সমস্ত মানবসভ্যতার ভবিষ্যত সম্বন্ধে আমাদের ভাবতে হবে। ভাববার কারণ হয়েছে।' আজ কবির আশঙ্কার 'ভাঙন ধরা নদীর কূল' যে একেবারে ভেঙে ধসে পড়ছে, তার প্রমাণ মেলে প্রতিনিয়ত। ভয়াবহ দারিদ্র আর কর্মহীনতায় মানুষ মরছে, অন্য দিকে মেরে ফেলা হচ্ছে মনুষ্যত্ব-নীতি নৈতিকতা-সুস্থ চিন্তাকে। যারা মারছেন, তাদের অন্যায় শাসন-শোষণ টিকিয়ে রাখার একমাত্র শক্তি মানুষে মানুষে বিভেদ-বিদ্বেষ। তাই ধর্ম-বর্ণ-জাতিগত পরিচয়ের দেওয়াল তুলে দেশজুড়ে তারা আটকাতে চাইছে মানুষের চেতনার জাগরণ, রুখতে চাইছে প্রতিরোধ।

এর মধ্যেই আসে পঁচিশে বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ। চলে অসংখ্য রবীন্দ্র-স্মরণ অনুষ্ঠান। আড়ম্বর-আয়োজনের অভাব চোখে পড়ে না, অভাব থেকে যায় উপলব্ধির। এই ভাঙনকালে দাঁড়িয়ে কী নিচ্ছি আমরা তাঁর থেকে? বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ বলেছেন, '...রবীন্দ্রনাথের বাণী প্রচার করার তোমার তখনই অধিকার, যখন রবীন্দ্রনাথের বুকের বেদনাটা তুমি আজও বুকে বহন কর।' রবীন্দ্রনাথকে যথার্থই শ্রদ্ধা জানাতে হলে শুধু কথায়-গানে-মালায় নয়, রবীন্দ্রচিন্তার সঠিক চর্চায়, সমকালীন সময়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্য দিয়ে আজ তাঁকে স্মরণ করতে হবে।

ছত্তিশগড়ে দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

দলের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৩০ এপ্রিল ছত্তিশগড়ের রায়পুরে সভা হয়। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং দেশের একমাত্র যথার্থ কমিউনিস্ট দল এসইউসিআই(সি) গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের কঠিন সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেন। সভাপতি ছিলেন রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ হারোড়ে।

শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু ক্ষতিপূরণের দাবি

নিশ্চিত কাজ এবং ভাল বেতনের লোভ দেখিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের এক এজেন্ট রামনগরের শেখ সাহেদ নামে (২৯) এক যুবককে থাইল্যান্ডে নিয়ে গিয়েছিলেন ৫ মার্চ। ২৮ মার্চ ওই শ্রমিকের মৃত্যুর খবর আসে। কিন্তু তাঁর মৃতদেহ পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছিল না।

মর্মান্তিক এই ঘটনা জানার সাথে সাথে অল ইন্ডিয়া মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা উপদেষ্টা নারায়ণ চন্দ্র নায়ক দ্রুত মৃতদেহ দেশে ফেরানোর দাবিতে শ্রমমন্ত্রী, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও জেলাশাসককে ১৪ এপ্রিল ই-মেল মারফত স্মারকলিপি দেন। ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি, মৃত ব্যক্তির পরিবারকে অন্তত ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানানো হয়। ১৮ এপ্রিল শ্রমমন্ত্রীর দপ্তরে উপরোক্ত দাবিতে স্মারকলিপি দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক জয়ন্ত সাহা, জেলা কমিটির আহ্বায়ক চন্দ্রমোহন মানিক প্রমুখ।

অবশেষে দু'মাস ৬ দিনের মাথায় ১২ মে থাইল্যান্ড থেকে ফিরে আসে ওই শ্রমিকের কফিনবন্দি দেহ। মরদেহে মাল্যদান করেন পরিযায়ী শ্রমিক সমিতির পূর্ব মেদিনীপুর জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক অমিত মান্না।

ওয়াটার ক্যারিয়ার ও সুইপার কর্মবন্ধুদের আন্দোলন

হাওড়া জেলার ওয়াটার ক্যারিয়ার ও সুইপার কর্মবন্ধুদের অনেকেরই বকেয়া টাকা ১৯৯৯ সাল থেকে অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি অথবা খুব কম পরিমাণে ঢুকেছে। সকলের বকেয়া টাকা অবিলম্বে মেটানোর দাবিতে ২৫ এপ্রিল হাওড়া এসডিএলআরও অফিসে এবং ৪ মে উলুবেড়িয়া এসডিএলআর অফিসে ডেপুটেশন দেন কর্মবন্ধুরা। দুই জায়গাতেই কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন।

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত হাওড়া জেলা ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ৪ মে উলুবেড়িয়া ভক্তার মোড় অফিসে 'মে দিবসের' তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা করেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মধুসূদন বেরা ও রাজ্য কমিটির সদস্য নিখিল বেরা।

শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে বীরভূমে বিক্ষোভ

সম্প্রতি তুমুল শিলাবৃষ্টিতে বীরভূম জেলার ৬টি ব্লকে চাষিদের বোরো ধান, তিলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কোথাও কোথাও ৮০ থেকে ১০০ শতাংশ ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। ফসল হারানো দুর্দশাগ্রস্ত চাষিদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে ২৮ এপ্রিল সিউড়ি ২ নম্বর ব্লক ও নানুর ব্লকের এডিএ-র কাছে এবং ১০ মে সাঁইথিয়া ব্লকে বিডিওর কাছে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের নিয়ে বিক্ষোভ ডেপুটেশন হয়। ঠিকা পদ্ধতিতে মালিকের কাছ থেকে জমি নিয়ে চাষাবাদ করা গ্রামীণ মজুররাও যাতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পান সেই দাবিও জানানো হয়।

একই সাথে সাঁইথিয়া ব্লকের কিছু গ্রামে খাসজমিতে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসরত গরিব পরিবারগুলির জমির পাট্টার দাবিও জানানো হয়। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাসদেন। নেতৃত্বে ছিলেন এ আই কে কে এম এস-এর বীরভূম জেলা সভাপতি বাগাল মার্ডি, সম্পাদক মান সিংহ।

পাঠকের মতামত

শিশু নির্যাতন বাড়ছে

ভগবানগোলা স্টেশনে প্রতিদিন হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে ৮ বছরের আরিফ সেখ, তাকে আর মা-কে ছেড়ে অন্যত্র সংসার পাতা আব্বাকে একবার দেখবে বলে। আরিফের মতোই এ দেশে লক্ষ লক্ষ শিশু বঞ্চিত হচ্ছে বাবা কিংবা মায়ের ভালবাসা থেকে। বিবাহ-বিচ্ছেদ, তালাক বা একাধিক বিয়ের কারণে। শিশুদের ক্ষেত্রে এটা কি কম নির্যাতন?

বাবা-মায়ের পরেই দ্বিতীয় অভিভাবক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কিন্তু তাঁদের সময় কম। হরেক রকম 'শ্রী'-এর ফর্ম ভরা, মিড ডে মিল, নানা সমীক্ষা, ভোটের ডিউটি, আরও বহু কিছু করতেই তাঁদের সময় চলে যায়। গ্রাম ও শহরগুলির দরিদ্র এলাকায় শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে স্কুলছুট ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সর্বত্র একই চিত্র। বিভিন্ন সরকারি স্কুলে ছাত্র কমতে শুরু করেছে। খাতায়-কলমে কিছু নাম থাকলেও সংবাদপত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, কলকাতা পুরসভার ১১৩টি স্কুলে কোনও ছাত্র নেই বা তাদের সংখ্যা এত কম যে স্কুল চালানো সম্ভব নয়। ভারত সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ২০১৯-২০ সালে ৫১,১০৮টি সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে ছাত্রের অভাবে। আবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ৭০১৮টি রাজ্য প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়েছে। প্রাথমিক থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত ৮২০৭টি বিদ্যালয় বন্ধকরার সিদ্ধান্ত হয়েছে। স্কুলছুট শিশু-কিশোররা বহু সময় নেশা ও অপরাধজগতেও জড়িয়ে যায়।

এ কথা সর্বজনগ্রাহ্য যে সরকারি স্কুলে পড়ার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। তাই অভাবী পরিবারগুলিতে বন্ধ হচ্ছে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা। বেসরকারি স্কুলে সন্তানদের নিয়ে যাওয়ার সাধ থাকলেও সাধ্য কোথায় তাদের? এই ব্যবস্থায় শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিশু-কিশোররা। এও কি কম নির্যাতন?

দেশের সত্তরভাগ মানুষ তো দারিদ্রসীমার নীচে। দু-মুঠো ভাত জোগাড় করতে মা-বাবাদের বাইরে যেতে হয় কাজে। অতি ছোট শিশুদের অভুক্ত থাকতে হয় দেখভালের অভাবে। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার পরিসংখ্যান অনুযায়ী দু'বছর হয়নি এমন ৫৯ লক্ষ শিশু অভুক্ত থাকে ভারতে। আজও তিনজন শিশুর মধ্যে একজন অপুষ্ট। সরকারি প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে খাদ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত এই দুধের শিশুরা।

খাদ্য ও শিক্ষা না পাওয়া গরিব শিশুরা সমাজে এখন নিরাপদে নেই। প্রতিদিন সংবাদমাধ্যমে নিখোঁজ বাচ্চাদের খবর দেখা যায়। শিশু-পাচারের বিশাল চক্রের ডালপালা ছড়িয়ে আছে গ্রামগঞ্জে উপজাতি, জনজাতি অঞ্চলে। এদের কাজে লাগানো হয় অপরাধমূলক কার্যকলাপ, বেগার খাটা, মাদক পাচার চক্র, যৌন ব্যবসা ইত্যাদিতে। ভারতে বছরে ১৩ লাখ শিশু পাচার হয়। ২০১৫ সালে রাজধানী দিল্লিতেই নিখোঁজ হয়েছে ২১ হাজার শিশু। ৯০ শতাংশেরই হদিশ পাওয়া যায়নি। প্রতি বছর এত শিশু নিখোঁজ হচ্ছে অথচ পুলিশ প্রশাসন কিছু করতে পারছে না। পাচার চক্রের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের গোপন আঁতাত ছাড়া এটা কি সম্ভব? এমনকি যে জায়গায় বাচ্চাদের নিরাপদে থাকার কথা, তা-ও হয়ে উঠেছে ভয়ের আস্তানা। মার্চ মাসে বহরমপুর নজরুল হোম থেকে ১১টি কিশোর উধাও হয়ে গেল!

শিশু ও নাবালিকাদের উপর যৌন নিগ্রহের ঘটনাও বেড়েই চলেছে। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রতি দু'জন শিশুর মধ্যে একজন যৌন নিগ্রহের শিকার। প্রতি চারটির মধ্যে একটি পরিবার মুখ খুলতে চায় না মূলত লোকলজ্জায়। সমীক্ষায় বলা হয়, ৯৮ শতাংশ যৌন নিগ্রহ হয় পরিচিত লোকজনদের দ্বারা।

নাবালিকা বিবাহ কিশোরীদের উপর নির্যাতন ছাড়া কিছু নয়। বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সরকারি তৎপরতা সত্ত্বেও ব্যাপক হারে গ্রাম ও শহরে বাল্যবিবাহ চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সংসদে জানিয়েছেন, বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশু পাচারে সারা দেশের মধ্যে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ। নাবালিকার গর্ভধারণ ও অকাল মাতৃত্বেও পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষে।

শিশু-কিশোর, বালক-বালিকাদের স্নেহ, ভালবাসা, খাদ্য, শিক্ষা, সচেতনতা, মর্যাদা ও নিরাপত্তার দায় নিতে হবে বাবা-মা, শিক্ষক, সরকার ও সুশীল সমাজকে। না হলে আগামী প্রজন্ম বড় হবে শিক্ষাহীন, সচেতনতাহীন, নীতিহীন মানসিকতা নিয়ে। তৎপরতার সাথে এ সমস্যা মোকাবিলা না করলে দেশের সমূহ ক্ষতি এড়ানো যাবে কি?

খাদিজা বানু
বহরমপুর

দাসপ্রথার থেকে কম ভয়াবহ নয়

আজকের বাঁধা-শ্রমিকদের জীবন

'চার দশক আগে ঠাকুরদার চিকিৎসার জন্য বাবা এক ইটভাটা মালিকের থেকে ৭ হাজার টাকা ধার নিয়েছিল। তিনি মারা গিয়েছেন। কিন্তু এই ঋণের জন্য গোটা পরিবার ভাটা মালিকের বাঁধা-মজুরে (বন্ডেড লেবার) পরিণত হয়েছে। ১৫ বছর আগে বাবা মারা গিয়েছেন, এখনও সেই ধার শোধ করে চলেছি। কত টাকা বাকি আমি জানি না। মালিক বলেছে আরও বেশ কয়েক বছর কাজ করতে হবে।'— বলছিলেন সুখাই রাম। উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌয়ের কাছে বরাবাঁকির বাসিন্দা।

সুখাই-এর মতো মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেছে অসংখ্য বাঁধা-মজুরের জীবনে। এক একটি পরিবারের প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাঁধা-শ্রমিকের প্রচণ্ড খাটনি খাটতে বাধ্য হয়। ২০১৬-এর একটি রিপোর্ট বলছে, ভারতে এরকম ১ কোটি ২০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৪০ লক্ষ বাঁধা-শ্রমিক রয়েছে, বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। বিশ্বে সব মিলিয়ে এই শ্রমিকের সংখ্যা ২৭ মিলিয়ন। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান দপ্তর এই সংখ্যা কমিয়ে দেখালেও বর্তমানে এই সংখ্যা আরও বেড়েছে। এদের মধ্যে শিশু-শ্রমিক রয়েছে অনেক।

তামিলনাড়ু, ওড়িশা, বিহার, কর্ণাটক, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ— প্রধানত এই রাজ্যগুলিতেই এই ধরনের শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। ইটভাটা বা অন্যান্য ক্ষেত্রে এদের অন্যায় ও অবৈধ ভাবে নিয়োগ করা হয়, চলে অমানুষিক শোষণ। ভাটা মালিকের অলিখিত নিয়মই এখানে আইন। শ্রমিকদের দিনে ১২-১৪ ঘণ্টা খাটানো হয়, কোথাও তারও বেশি। কাজের ঘণ্টা নির্দিষ্ট নেই। রোদে পুড়ে, আধপেটা খেয়ে, জীর্ণ শরীরে ১০০০টি ইট তৈরি করলে তবে ২০০ টাকা পাওয়া যাবে। পরে ওই ইটগুলি হাজার হাজার টাকায় বিক্রি করে মুনাফা লোটে মালিক। সংসার চালানোর দায়ে বেশিরভাগ গরিব, দলিত পরিবারের মানুষ এই কাজে ঢোকেন। পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এই মানুষগুলোর উপর অন্যায়-জবরদস্তি চালাতেও সুবিধা হয়। ন্যায্য মজুরি দূরের কথা, কাজের ঘণ্টা-হিসাবে তাদের কত টাকা পাওয়ার কথা, তাও ভাল করে বোঝেন না অনেকে। ধার-কর্জের হিসাবও রাখতে পারেন না। পাওনাদাররা পছন্দমতো টাকা ধার হিসাবে দেখিয়ে এই শ্রমিকদের রক্ত-জল করা পরিশ্রম শুষে নেয়। বছরের পর বছর চলে এই অমানবিক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। এরকম এক একটি শ্রমিক পরিবারে শিশুও জন্মায় শোষণের এই পেষাই-কলে ছিবড়ে হওয়ার ভবিতব্য নিয়ে।

দালালের মাধ্যমে প্রধানত এসব শ্রমিকদের নিয়োগ হয়। দালালরা কারখানা মালিকের সাথে চুক্তি করে শ্রমিকদের নানা টোপ দিয়ে কর্মস্থলে পরিবার নিয়ে আসতে বলে। পরিবারের সাথে একত্রে থাকার বন্দোবস্ত হবে ভেবে শ্রমিকরা এই প্রস্তাবে রাজিও হয়। কর্মস্থলে রাখার ব্যবস্থা করে তাদের হাতে অগ্রিম টাকা গুঁজে দেয় দালাল। এই টাকাটা শুরুতে ধার হিসাবে দেওয়া হয়। অগ্রিম টাকা নিলেই সেই শ্রমিক ফাঁদে পড়ে যায়, শোধ করার জন্য কাজ করতে বাধ্য হয় সেখানে। ভাটামালিক-দালালের ঘৃণ্য চক্র এভাবেই শ্রমিককে ঋণের ফাঁদে ফেলে। শ্রমিক কাজ করতে না চাইলে বা মালিকের পছন্দমতো কাজ না হলে জোটে অকথ্য অত্যাচার। শত অত্যাচারেও সেই জায়গা ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারে না শ্রমিকরা। প্রাচীন কালে দাস-প্রভুদের মর্জিমতো যেমন দাসশ্রমিকদের চলতে হত, অন্য মালিকের কাছে ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারত না, তেমনই একবিংশ শতাব্দীতে আজও এভাবে দাস-প্রথা টিকে রয়েছে সমাজের বুকে।

ইটভাটাগুলিতে মহিলাদের নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই। শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই। মালিকের একমাত্র লক্ষ্য কত বেশি খাটিয়ে কত কম মজুরি দেওয়া যায়। তার উপর মহিলাদের উপর চলে যৌন নির্যাতন। ঝাড়খণ্ড, বিহার থেকে উত্তরপ্রদেশে আসা এরকম বহু মহিলা-শ্রমিক ভাটা মালিকের লালসার শিকার হন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনও অভিযোগও দায়ের হয় না কাজ থেকে ছাঁটাই হওয়ার ভয়ে। একে পরিবার প্রতিপালন করতে হিমশিম দশা, তার উপর কাজ চলে গেলে পেট চলবে কী করে? লাচার অবস্থায় কাজ করতে হয় দরিদ্র পরিবারের মহিলা শ্রমিকদের। এত করেও পরিবারের সদস্যদের পেট ভরাতে পারে না তারা। অনাহারে মারা যায় অনেকের শিশুসন্তান। এদের শিশুসন্তানরা স্কুলে যাওয়ার সুযোগ তো পায়ই না, উপরন্তু বাবা-মাকে সাহায্য করতে বাধ্য হয় ভাঙা ইট কুড়িয়ে। এভাবে শৈশব থেকেই তারা দাসত্বের জীবনে এক ধাপ এগিয়ে যায়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এবং সামান্য মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয় রাজস্থানের ইটভাটাগুলিতে কাজ করা অসংখ্য শিশু-শ্রমিক। ১০-১২ ঘন্টা কঠোর শ্রম দেওয়ার পর তারা মাত্র ১০০ টাকা মজুরি পায়।

শুধু ইটভাটা নয়, শ্রমিক শোষণের ছবিটা একই অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেও। উত্তরপ্রদেশে কার্পেট শিল্পে বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে কাজ করতে আসা পরিযায়ী শ্রমিকরা ঠাসাঠাসি অবস্থায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকতে বাধ্য হন। সেখানেও পরিস্থিতি ভয়াবহ। এখানকার শিশুদের পরিণতি ইটভাটায় কাজ করা শিশুদের মতোই। চুড়ি শিল্পের অবস্থাও ভয়ঙ্কর। এখানে বাঁধা-শ্রমিকদের উপর শোষণ ভয়াবহ। কমপক্ষে ৩৫০টা কাচের চুড়ি তৈরি করে মাত্র ৬ টাকা মজুরি মেলে। গোটা পরিবার ১২-১৪ ঘণ্টা কাজ করে প্রতিদিন এরকম ৩০ লট চুড়ি তৈরি করতে পারে। কঠিন শ্রম করে আয় হয় মাত্র ১৮০ টাকা। ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এতে ক'জনের পেট চলে!

ইটভাটা, কার্পেট বা চুড়ি শিল্প কোথাও শ্রমিক-নিরাপত্তা বলতে প্রায় কিছু নেই। কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ ভাল নয়। শ্রমিক অধিকার নিয়ে আইন রয়েছে, কিন্তু দিব্যি আইন ভঙ্গও করে চলেছে শিল্প-মালিকরা। ১৯৭৬-র বন্ডেড লেবার সিস্টেম (অ্যাবলিশন) অ্যাক্ট রয়েছে, ১৯৮৬-র জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট রয়েছে। কিন্তু শিশুশ্রমিকদের বহাল করা যেমন চলছে অনায়াসে, তেমনই তাদের কাজের নিরাপত্তা নিয়েও কারখানা কর্তৃপক্ষের কোনও মাথাব্যথা নেই। সরকারের কি চোখে পড়ে না শিশুশ্রমিকদের দুর্দশা? নাকি তারা দেখেও না দেখার ভান করেন? এমনকি যে সব ক্ষেত্রে মালিক শিশু-শ্রমিকদের নিয়োগ করছে, তাদের শাস্তির কোনও ব্যবস্থা করছে না সরকার। সরকারের উদাসীনতা মালিকদের আরও বেপরোয়া করে তুলছে। অথচ এই নেতা-মন্ত্রীরাই শিশুশ্রম নিয়ে, আইন নিয়ে বড় বড় বক্তৃতা দেন। শিশু-শ্রমিকদের উদ্ধার করে অন্যত্র থাকা-খাওয়া-পড়াশোনার ব্যবস্থা করা কি সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না?

পুঁজিবাদী সমাজে কারখানা-মালিকের তীব্র মুনাফা লালসার মূল্য জীবন দিয়েও দিতে হচ্ছে শ্রমিকদের। এমনকী রেহাই পাচ্ছে না ছোট ছোট শিশুরাও। মার্কস দেখিয়েছিলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মালিক শ্রমিককে ততটুকুই মজুরি দেয়, যতটুকু হলে সে খেয়ে-পরে বেঁচে থেকে মালিকের মুনাফা জোগানোর কাজটুকু করতে পারে। আজ চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের সে বালাইও নেই। একজন শ্রমিক মারা গেলে হাজার হাজার অভুক্ত শ্রমিক অপেক্ষা করে আছে একটা কাজের জন্য। তাই আজকের এই দমবন্ধ করা পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে মালিকের কাছ থেকে প্রাপ্য অধিকার আদায়ের জন্য ন্যায়সঙ্গত শ্রমিক আন্দোলনই একমাত্র পথ।

ইউরোপ-আমেরিকায় শ্রমিক শ্রেণির
ধর্মঘট লিখছে নয়া ইতিহাস

সমগ্র ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স শ্রমিক ধর্মঘটে উত্তাল। ব্রিটেন-আমেরিকা সহ সমগ্র বিশ্বে পুঁজিবাদী অর্থনীতি আজ প্রবল আর্থিক সংকটে হাবুডুবু। যে শ্রমিকরা জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবনকে মালিকদের স্বার্থে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছে— পুঁজিবাদী সঙ্কটের সমস্ত বোঝা আজ তাদেরই বহন করতে হচ্ছে। লেঅফস ডট ফাই-এর তথ্য অনুযায়ী মেটা, অ্যামাজন, গুগল, মাইক্রোসফট সহ অসংখ্য আইটি ও বৃহৎ কর্পোরেশন ২০২২-'২৩ সালে ২ লক্ষেরও বেশি শ্রমিককে ছাঁটাই করেছে। মালিক শ্রেণির এই অন্যায় ছাঁটাই, লে-অফের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণি আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সর্বত্র। মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, মজুরি বাড়ানোর দাবিতে, ছাঁটাই লে-অফ প্রতিরোধে, কাজের বোঝা বাড়ানোর বিরুদ্ধে— আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্সের শহরগুলোতে আছড়ে পড়ছে শ্রমিক আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ। ভারতে অবরোধ, ধর্মঘট, বনধ-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করতে গিয়ে যে সংবাদমাধ্যমগুলো ইউরোপ আমেরিকার শিল্প ক্ষেত্রে অবরোধ, প্রতিরোধ, আন্দোলন নেই বলে গল্প লিখত, তারাই আজ সেই দেশগুলোর শ্রমিক ধর্মঘটের কথা লিখতে বাধ্য হচ্ছে। ফ্রান্সের একটি সাপ্তাহিক শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন নিয়ে লিখেছে— 'প্যারিসের সুবিশাল চত্বরে সমবেত হয়েছেন হাজার হাজার আন্দোলনকারী, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে। গলা তুলেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ... ফ্রান্স মানে যে আজও প্রথমত ও প্রধানত বারুদ, অন্যায়ের সামনে প্রতিরোধ, পিঠ নুইয়ে নয়, ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ানোর হিম্মত— তা আবার প্রমাণ করেছে ক্রুদ্ধ ও অবরুদ্ধ আজকের এই ফ্রান্স। বিদ্রোহের দিনপঞ্জিকা লিখে চলেছে সে।'

আমেরিকা, ফ্রান্সের শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে সেখানকার দৈনিক পত্রিকাগুলো প্রায় সকলেই মাসের পর মাস প্রায় প্রতিদিনের ধর্মঘটের তালিকা প্রকাশ করছে, যা প্রকৃতই শ্রমিক সংগ্রামের দিনপঞ্জিকা। চারিদিকের এই বিদ্রোহে ধর্মঘট লিখছে নয়া ইতিহাস। শুধু শ্রমিক ধর্মঘটই নয়, স্টারবাগ, অ্যামাজন, অ্যাপেল সহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা নতুন করে শ্রমিক ইউনিয়ন তৈরি করতে বিপুল সংখ্যায় আবেদনপত্র জমা দিয়েছে। আমেরিকার লেবার বুরো যে প্রধান ২০টি শ্রমিক ধর্মঘটের কথা উল্লেখ করেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— নিউইয়র্ক টাইমসের ধর্মঘট, ক্যালিফোর্নিয়ার হেলথ কেয়ার কোম্পানি কাইজার পারমানেন্টটির শ্রমিক ধর্মঘট, ফ্রন্টিয়ার কমিউনিকেশনের শ্রমিক ধর্মঘট ও ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার, হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট।

ফ্রান্সের রাজপথে বিক্ষোভের জোয়ার

শ্রমিকদের নিয়ে গবেষণা করেন এমন একজন লিখেছেন— 'আজকের শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমিক ইউনিয়ন তৈরির জোয়ার এনেছে আমেরিকায়। আমেরিকার বুরো অফ লেবার স্ট্যাটিসটিক্স যে শ্রমিক ধর্মঘটের খতিয়ান দিচ্ছে সেই পরিসংখ্যানকে অনেকে মনে করছেন তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র।' আবার ব্রিটেনের নার্স, জুনিয়ার ডাক্তার, লন্ডনের বাসচালক, ইউরোস্টার-এর নিরাপত্তা কর্মী, সীমান্তরক্ষী এজেন্ট, হিথরো বিমানবন্দরের কর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসক, স্কটল্যান্ডের শিক্ষক, ওয়েলসের ফিজিওথেরাপিস্ট, নর্দান ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের ড্রাইভিং পরীক্ষক, ব্রিটেনের ন্যাশনাল হাইওয়ে কর্মী সহ সকল ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী মাসের পর মাস লাগাতার ধর্মঘটে সামিল। ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার এশিয়া সংস্করণ আরও লিখেছে, ট্রেন ড্রাইভার থেকে রেলকর্মী ও নার্স, জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মী ও সিভিল সার্ভেন্ট সব আন্দোলনেই জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থন আছে। শ্রমিক আন্দোলনের এই উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে পুঁজিবাদী শোষণ নিপীড়নের অবসানের বার্তাও ধ্বনিত হচ্ছে। ফ্রান্সের এক কলেজ-ছাত্র বলছেন, 'আমাদের সমস্যার একদম মূলে যেতে হবে। বুঝতে হবে, এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আমাদের জীবনকে কী ভাবে বিধ্বস্ত করছে, জীবনকে পিষে মারছে, আমাদের গ্রহটাকে ধ্বংস করছে। এই ব্যবস্থাটাই সমাজের যাবতীয় রোগের আঁতুড়ঘর। এই ব্যবস্থাটার উপর আগে আঘাত হানতে হবে।'

ভারতেও আন্দোলন আছড়ে পড়ছে। দিল্লির রাজপথে প্রায় এক বছর ধরে তাঁবু খাটিয়ে কৃষক আন্দোলন হয়েছে যা চরম উদ্ধত সরকারের মাথা নত করেছে। এই আন্দোলন বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ডিএ-র দাবিতে সরকারি কর্মীরা রাজপথে অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন মাসের পর মাস ধরে। মানুষ আন্দোলনমুখী হচ্ছে সরকারের নীতির বিরুদ্ধে। বেকার যুবকদের দীর্ঘনিঃশ্বাস ও ছাঁটাই শ্রমিক পরিবারের অনাহারের যন্ত্রণা সরকার চাপা দিতে পারছে না। ধর্মীয় জয়ধ্বনিতে চাপা পড়ছে না দিনভর অভুক্ত থাকা দু'বছরেরও কম বয়সী ৫৯ লক্ষ ভারতীয় শিশুর বুকফাটা কান্না। এটাও চাপা দেওয়া যাবে না গুজরাটে গত পাঁচ বছরে প্রতিদিন ৯ জন দিনমজুরের আত্মহত্যার খবর। যেমন আড়াল করা যাবে না প্রতি ঘণ্টায় ১০০ জন ভারতীয় কৃষকের ভূমিহীনে পরিণত হওয়া ও ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া হাজার হাজার কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা।

ইউরোপ-আমেরিকার শ্রমজীবী মানুষ যেমন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ছাঁটাই, মূল্যবৃদ্ধির তীব্র আক্রমণে দিশেহারা না হয়ে লাগাতার ধর্মঘটের মাধ্যমে মাথা উঁচু করে বাঁচার রাস্তা করে নিচ্ছেন, তেমনই ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণিকেও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ময়দানে মালিক শ্রেণির সেবাদাস সরকারের জুলুম, শোষণ, বিভেদ সৃষ্টির বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে বাঁচবার পথ করে নিতে হবে।

কর্ণাটকে বিজেপির পরাজয়

একের পাতার পর

শ্রমিকবিরোধী নীতি নিয়ে চলেছে। এমনকি মহিলা কুস্তিগিররা যৌন হেনস্তার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে দিল্লিতে বিক্ষোভ অবস্থান চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ন্যায্য দাবিতে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। ছদ্ম জাতীয়তাবাদ, ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা ফেরি করেছে বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রীকে তাদের নির্বাচনী মুখ হিসাবে তুলে ধরেছে। এ সব সত্ত্বেও এবং উপরোক্ত কারণে কর্ণাটকের সাধারণ মানুষ বিজেপিকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেছেন। লক্ষ করার মতো বিষয়, প্রধানমন্ত্রী মোদি, অমিত শাহ, জে পি নাড্ডা সহ তাবড় নেতারা কর্ণাটকে নির্বাচনী প্রচারে ব্যাপক ভাবে নামা সত্ত্বেও বিজেপিকে হেরে যেতে হল। সেই অর্থে এই পরাজয় শুধু বিজেপির কর্ণাটক রাজ্য নেতৃত্বেরই নয়, প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বেরও। তবে, বিজেপির পরাজয় সত্ত্বেও জনসাধারণকে সতর্ক থাকতে হবে। এবার যে রাজনৈতিক দল সরকারি ক্ষমতায় বসতে চলেছে, তারা যাতে কোনও জনবিরোধী নীতি নিতে না পারে, জনসাধারণকে একই রকম ভাবে সক্রিয় থেকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

এই লক্ষ্যে জনগণের উদ্দেশে এস ইউ সি আই (সি) জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে, যাতে সেই আন্দোলনের চাপে নতুন সরকার জনবিরোধী নীতি গ্রহণে বিরত থাকতে এবং রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে বাধ্য হয়।

জীবনাবসান

কলকাতা জেলায় এস ইউ সি আই (সি)-র প্রবীণ সদস্য কমরেড বন্দনা রায় ৭ মে আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজের বাসস্থানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু দলের কর্মী সমর্থক দরদিদের মধ্যে গভীর বেদনার সৃষ্টি করে।

সত্তরের দশকের শুরুতে এক রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় তাঁর অগ্রজ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, সদ্য প্রয়াত কমরেড অনীশ রায়ের মাধ্যমে তিনি দলের বৈপ্লবিক চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। প্রথমে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক পত্রিকা 'পথিকৃৎ'-এর সঙ্গে যুক্ত হন এবং পরবর্তীকালে দক্ষিণ কলকাতার পদ্মপুকুর এলাকায় পার্টি ইউনিটে সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কাজ শুরু করেন।

মেধাবী ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও দল ও বিপ্লবের প্রয়োজন উপলব্ধি করে চাকরির প্রলোভন বিসর্জন দিয়ে তিনি দলের সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার সংগ্রামে ব্রতী হন। নেতৃত্বের নির্দেশে দলের সর্বভারতীয় মুখপত্র 'প্রলেটারিয়ান এরা'-র প্রকাশনের কাজে যুক্ত হন এবং আমৃত্যু নিষ্ঠার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করেন।

সাহিত্য, সিনেমা, নাটক, চিত্রকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অসীম আগ্রহ ছিল এবং ব্যক্তিগতভাবে এ সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতেন ও নিয়মিত চর্চা করতেন।

তিনি পার্টির বালিগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদিকা হিসেবেও বেশ কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। ৮০-৯০-এর দশকে দলের পরিচালনায় গড়ে ওঠা প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার আন্দোলন এবং রেলভাড়া ও বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রতিটি কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন ও একাধিকবার কারাবরণও করেছেন।

তিনি প্রচারবিমুখ ও অন্তর্মুখী ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে সততা, নির্লোভ মানসিকতা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণগুলির জন্য কাছাকাছি আসা আত্মীয়, বন্ধু ও পরিচিত মানুষদের উপর সহজেই ছাপ ফেলতে পারতেন। গৃহশিক্ষক হিসেবেও তাঁর সুনাম ছিল।

দলের বিপ্লবী চিন্তাকে পাথেয় করে জীবন ও সংগঠনে নানা ওঠাপড়ার মধ্যে নিজের সংগ্রামকে সদর্থক রাখার চেষ্টা সর্বদা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

কমরেড বন্দনা রায়ের মরদেহ চেতলা পার্টি অফিসে নিয়ে আসা হয়, সেখানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষালের পক্ষে কমরেড শিবাজী দে, পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ীর পক্ষে কমরেড নভেন্দু পাল, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ডাঃ কিষান প্রধান, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুদীপ্ত দাশগুপ্ত সহ দলের অন্যান্য নেতা ও কর্মীবৃন্দ। পরে কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

২৩ মে দক্ষিণ কলকাতার সুজাতা সদন হলে কমরেড বন্দনা রায় স্মরণে সভা।

কমরেড বন্দনা রায় লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

দিল্লিতে আন্দোলনরত কুস্তিগিরদের সমর্থনে
১৮ মে কলকাতায় ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের সংহতি মিছিল

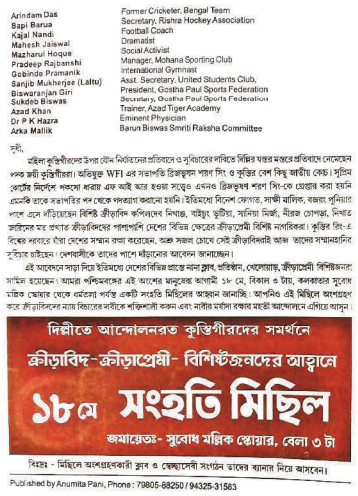

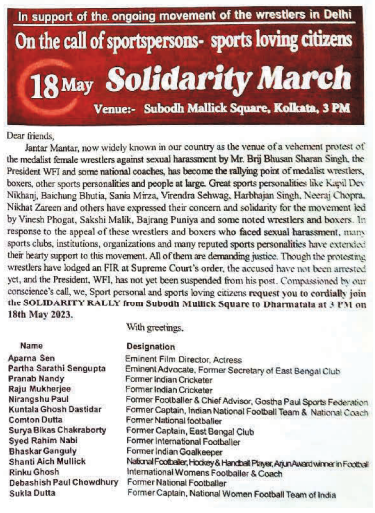

রাজ্যের ১২১ জন ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ এই সংহতি মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য সব স্তরের মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। মিছিল শুরু সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে

ত্রিপুরায় কলেজ-ছাত্রী ধর্ষণ
অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ

সম্প্রতি ত্রিপুরায় আমতলি বাইপাসে কলেজ ছাত্রীকে গণধর্ষণ ও অমরপুরের বৈশাখী মেলা থেকে অপহরণ করে দুই কিশোরীকে গণধর্ষণ করার ঘটনা ঘটেছে। যেভাবে ধর্ষণ, গণধর্ষণ, অপহরণ, পাচারের মতো অপরাধমূলক ঘটনা প্রতিদিন বেড়ে চলেছে তাতে রাজ্যের মানুষ বিশেষ করে মহিলারা সম্মান ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। অভিভাবকরা মেয়েদের স্কুল-কলেজ ও গৃহশিক্ষকের কাছে পাঠাতেও ভয় পাচ্ছেন। বহু যুবতী বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে। বহু ঘটনাই প্রকাশ্যে আসছে না। পুলিশ-প্রশাসনের তৎপরতার অভাবে বহু ঘটনার এফআইআর দাখিল হচ্ছে না। মহিলাদের উপর সংঘটিত অপরাধের সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে মদ, মাদক দ্রব্যের ব্যবসা, জুয়া, ইন্টারনেট ইত্যাদি। এই পরিস্থিতিতে এআইএমএসএস, এআইডিওয়াইও, এআইডিএসও ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ১২ মে ডিজিপি অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনগুলি দাবি জানায় — দুটি স্থানে গণধর্ষণে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার, দোষীদের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে বিচার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, গণধর্ষণের শিকার ছাত্রীদের চিকিৎসা, নিরাপত্তা, উপযুক্ত আর্থিক সহায়তা সুনিশ্চিত করা, অপহরণ ও নারী পাচার প্রতিরোধে পুলিশ প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ, মদ ও মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, জুয়া-সাট্টা বন্ধ করা, ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি প্রচার কঠোর ভাবে বন্ধ করা সহ ৯ দফা দাবি জানানো হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতির প্রতিবাদে তামিলনাড়ুতে
সরকারি কমিটি থেকে পদত্যাগ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের

রাজ্যের জন্য একটি শিক্ষানীতি তৈরি করতে তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকার গত বছর ১৩ সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি তৈরি করেছিল। এতে আহ্বায়ক-সদস্য ছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক এল জওহর নেশন। তিনি ওই কমিটিতে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে না পারার এবং কমিটির সরকারি সদস্যদের দ্বারা তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে শাসানি, অপমান প্রভৃতির অভিযোগ করে সম্প্রতি কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন।

অধ্যাপক নেশন কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে তামিলনাড়ুর জনগণের জীবনের সমস্যা, সামাজিক অবস্থা, শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে সামনে রেখে বিজ্ঞান এবং যুক্তিনির্ভর একটি শিক্ষানীতি তৈরিতে উদ্যোগী হন। কিন্তু এই কাজে তিনি সরকারি সদস্য অফিসারদের দ্বারা পদে পদে বাধা পেতে থাকেন। তাঁর কাজে কতগুলি নির্দিষ্ট শর্ত বেঁধে দেন তাঁরা। তিনি স্বাধীন ভাবে কাজ করার দাবি জানিয়ে এবং অফিসার-সদস্যদের আচরণের বিরুদ্ধে কমিটির চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ডি মুরুজেশনের কাছে অভিযোগ জানান। চেয়ারম্যান কোনও প্রতিকারের উদ্যোগ না নিয়ে নীরবই থাকেন। এই পরিস্থিতিতে অধ্যাপক নেশন মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকেও কোনও প্রতিক্রিয়া না পেয়ে তিনি বুঝতে পারেন, সরকার স্বাধীন কোনও শিক্ষানীতি চায় না। দেখা যায়, রাজ্যের শিক্ষানীতির নামে আসলে যা তৈরি হতে যাচ্ছে তা বাস্তবে জাতীয় শিক্ষানীতিরই অনুকরণ মাত্র।

অধ্যাপক নেশন বলেন, ১৯৪৯-এ রাধাকৃষ্ণন কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কমিটি সদস্যদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রস্বার্থে শিক্ষানীতি তৈরি করা দরকার ছিল। কমিটি গঠনের ১১ মাস অতিক্রান্ত হলেও শিক্ষার মৌলিক বিষয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি। এই পরিস্থিতিতে কমিটির কাজে তাঁর কোনও কার্যকরী ভূমিকাই থাকবে না বুঝে তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক নেশন অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। সেভ এডুকেশন কমিটি দেশ জুড়ে সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন অধ্যাপক নেশন। দেশের মানুষ তাঁর এই বলিষ্ঠ ও সাহসী ভূমিকার প্রতি কুর্নিশ জানাচ্ছে।

কুস্তিগিরদের আন্দোলনের সমর্থনে
স্বাস্থ্যকর্মীদের মিছিল মেচেদায়

কুস্তিগিরদের উপর যৌন নির্যাতনকারী বিজেপি সাংসদের কঠোর শাস্তির দাবিতে ১২ মে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মেচেদায় মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী ও নাগরিকদের মৌন মিছিল। নেতৃত্ব দেন বিশিষ্ট চিকিৎসকরা

রিসার্চ স্কলারদের সংগঠন ডিআরএসও কর্ণাটক চ্যাপ্টার কানাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ মে 'সেভ রিসার্চ ডে' পালন করে। সারা দেশে নানা প্রতিষ্ঠানে দিনটি পালিত হয়।

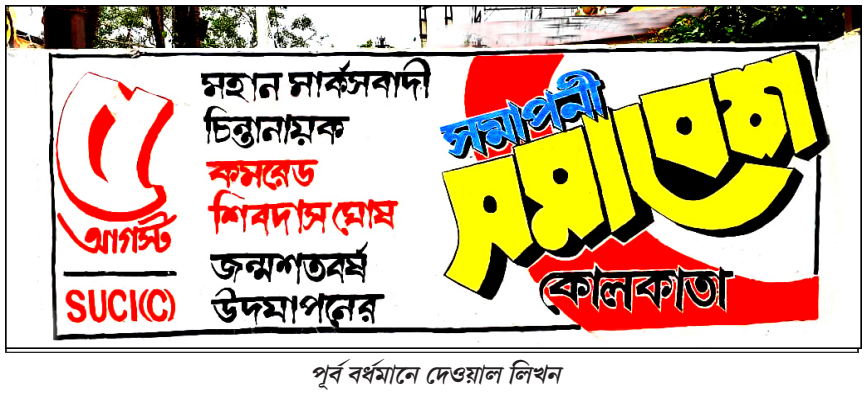

পূর্ব বর্ধমানে দেওয়াল লিখন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com